মো. হায়দার আলী

মহান ও নিবেদিত পেশা হিসেবে শিক্ষকতা সর্বজন স্বীকৃত। মানুষ গড়ার কারিগর হিসেবেই মনে করা হয় শিক্ষকদের। পাঠদানে আত্ম-নিয়োগ, শিক্ষার্থীদের মধ্যে নিহিত থাকা সুপ্ত মেধা জাগ্রত করা, দুঃস্থ ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের নিজের অর্থ ব্যয়ে দেশসেরা হিসেবে গড়ে তোলা শিক্ষকও দেশে বিরল নয়। এ জন্যই সমাজে শিক্ষকরা সবচেয়ে বেশি সম্মানিত, শিক্ষার্থীরাও যুগে যুগে স্মরণ রাখেন তাদের। একটি জাতির অগ্রগতি কিংবা উন্নতির প্রধান সোপান হলো শিক্ষা। শিক্ষার ওপর নির্ভর করেই সে জাতি গড়ে ওঠে। তাই বলা হয়, 'শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড।' এজন্য বিশিষ্টজনেরা বলেন, একটি জাতিকে ধ্বংস করতে হলে সে জাতির শিক্ষাব্যবস্থাকে আগে ধ্বংস করতে হবে। বিশ্বের অন্যান্য দেশ বা জাতির দিকে তাকালেই বোঝা যাবে তাদের অগ্রগতির পেছনে শক্তি হিসেবে শুধু অস্ত্র-সমারাস্ত্র কাজ করেনি; বরং কাজ করেছে তাদের শিক্ষাদীক্ষা। আর এই শিক্ষা শব্দটির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে শিক্ষকতা নামক মহান পেশা। আমাদের দেশে শিক্ষাব্যবস্থা তিন স্তরবিশিষ্ট। প্রাথমিক, মাধ্যমিক এবং উচ্চশিক্ষা বা বিশ্ববিদ্যালয় স্তর। দেশের সকল প্রাথমিক শিক্ষা পর্যায়ক্রমে জাতীয়করন বা সরকারী করা হয়েছে। মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা জাতীয়করণের দাবীতে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে তালাঝুলিয়ে জাতীয় প্রেসক্লাবে ব্যানার, পোস্টার নিয়ে তাঁরা আন্দোলন করছেন ১১ জুলাই থেকে। যে যুক্তি দাঁড় করিয়ে তাঁরা আন্দোলন করছেন, সেগুলোকে তাঁরা ন্যায্য অধিকার হিসেবে মনে করছেন। তাদের দাবীর সাথে সহমত প্রকাশ করে শিক্ষাবিদ, প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা, আইনজীবী, রাজনীতিবিদ, সাংবাদিক, সুশীল সমাজের প্রতিনিধিগণ। ক্রিকেটার তামিম ইকবাল অবসরের ঘোষনা দেয়ার সাথে সাথে একজন এমপির মাধ্যমে স্বপরিবারে প্রধান মন্ত্রীর সাথে দেখা করার সুযোগ পাই তবে আন্দোলনকারী লাখ লাখ শিক্ষকদের পক্ষে দেশের একজন এমপি, মন্ত্রী নেই, সত্যকথা বলার সাহস নেই। তার মাধ্যমে শিক্ষকদের কষ্টের কথা, অবমূল্যয়নের কথা গুলি প্রধান মন্ত্রী অবহিত বিষয়টির একটি সুন্দর সমাধান বের করে আনবেন। যাতে করে শিক্ষক কর্মচারীগণ, অভিভাবক, শিক্ষার্থীদের উপকারে আসবে উপকৃত হবে দেশ, জতি, সমাজ। দেশে মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ২০ হাজার ১৬০ টি। বিপরীতে সরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ৬৮৪টি। সরকারি-বেসরকারি মিলে মাধ্যমিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে শিক্ষার্থীর সংখ্যা প্রায় ১ কোটি ২ লাখ। শিক্ষক প্রায় সাড়ে ৫ লাখ। ১৭ ভাগ শিক্ষার্থী বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পড়ালেখা করে।। মাধ্যমিক শিক্ষকদের যে বেতন-ভাতা, তা দিয়ে দ্রব্যমূল্যের অগ্নিবাজারে পরিবার চালানো বেশ কষ্টসাধ্য। এমপিওভুক্ত শিক্ষকরা ২৫ শতাংশ উৎসব ভাতা, ১ হাজার টাকা বাড়িভাড়া এবং ৫০০ টাকা চিকিৎসা ভাতা পান। একই কারিকুলামের অধীনে থেকেও সরকারি ও বেসরকারি শিক্ষকদের মধ্যে বিশাল বৈষম্য। শিক্ষাকে জাতির মেরুদন্ড আর শিক্ষকরা সেই মেরুদন্ডের রূপকার। তাদের শেখানো পাঠপঠনে আগামী দিনের ভবিষ্য। হয়ে ওঠে শিক্ষার্থীরা। মুখে 'শিক্ষকতা মহান পেশা' স্বীকার করে শিক্ষকদেরও যে সংসার আছে, মৌলিক চাহিদা আছে, সেদিকে তাকানোর সময় নেই। জাতীয়করণের ব্যপারে শিক্ষামন্ত্রী প্রায় বলে থাকেন এটা গবেষেনার ব্যপার। ওই সব শিক্ষকদের ব্যপারে অসত্য কথা বলে থাকেন। বাংলাদেশের শিক্ষা জাতীয়করণ নিয়ে আলোচনা-আন্দোলন-গবেষণা বহুদিনের। দিনে দিনে তা কেবল জটিল হচ্ছে। বেসরকারি শিক্ষকরা সেই সরকারি তিরিশ টাকা অনুদান দিয়ে শুরু করে আজ মূল বেতনের একশ' ভাগ সরকারি কোষাগার থেকে পাচ্ছেন। এটি সহজে হয়নি, কোনো সরকার ইচ্ছে করেই এটি দিয়ে দেয়নি। এটি শিক্ষকদের বহুদিনের আন্দোলনের ফসল। দেশে প্রাইমারি শিক্ষা জাতীয়করণের গোড়া পত্তন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের হাতে। তখন আমাদের জিডিপির আকার ছিল প্রায় ১৪ বিলিয়ন ডলার, এখন তা ৪০০ বিলিয়নের ওপর। বহু বছর ধরে মাত্র ৩১৭টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ছিল সরকারি। সরকার যেসব উপজেলায় সরকারি বিদ্যালয় ছিল না সেগুলোকে সরকারি ঘোষণা করায় বর্তমানে সংখ্যাটি ৬৮০। অর্থাৎ এগুলোর পুরো দায়-দায়িত্ব সরকারের, বাকি প্রায় বিশ হাজার মাধ্যমিক বিদ্যালয় বেসরকারি। মাধ্যমিক পর্যায়ের আরো ৯ হাজারের মতো মাদ্রাসাও রয়েছে। দেশের শিক্ষার দায়িত্ব সরকারের। অথচ দেখা যায়, সরকার এমন কিছু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে সরকারি করে, যাতে সরকারের কোষাগার থেকে অতিরিক্ত কোনো অর্থ খরচ করতে না হয়। আবার উল্টোটিও দেখা যায়, কোনো প্রভাবশালী নেতা তার এলাকার কোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান তার অবস্থা যতই খারাপ থাকুক না কেন জাতীয়করণ করে ফেলেছেন। তা আরেক ধরনের বৈষম্য তৈরি করছে। গ্রামীণ এলাকার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো বেশি অবহেলার শিকার। এগুলোর অর্থনৈতিক অবস্থা ভালো নয়, নির্দিষ্টসংখ্যক শিক্ষক নেই। ভালো শিক্ষকরা সেখানে যেতেও চান না। জাতীয়করণ করা হলে অবহেলিত এই জনগোষ্ঠীর শিক্ষার অধিকার ও মান নিশ্চিত সম্ভব হবে বলে একটি মত রয়েছে। আবার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর শিক্ষক-শিক্ষার্থীর অনুপাত উপযুক্ত শিক্ষা গ্রহণের অন্তরায়। যতদিন পর্যন্ত একটি শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীর সংখ্যা ২০ হতে ২৫ এ সীমাবদ্ধ রাখতে ব্যর্থ হবো ততদিন আমরা শিক্ষার শতভাগ সুফল পাবো না। শুধু তাই নয়, অতিরিক্ত শিক্ষক নিয়োগ না করে দুই বা ততোধিক শাখায় পাঠদানের ফলেও শিক্ষার মান ক্রমশ নিম্নগামী হচ্ছে। দেশে প্রচলিত কিন্ডারগার্টেন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও ইংরেজি ভার্সনের উপর সরকারের

যথাযথ নিয়ন্ত্রণ নেই। এইসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ন্যাশনাল কারিকুলামের বাইরে গিয়ে স্বেচ্ছাধীনভাবে অতিরিক্ত বিষয়ের পাঠদান করে শিক্ষার্থীদের মেধা-মনন নষ্ট করছে। উপরন্তু বাজারের গাইড বইগুলো শিক্ষার্থীদের সৃজনশীল প্রতিভার প্রতিবন্ধক হিসেবে কাজ করছে। বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর দেখভালের দায়িত্ব কখনো রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গের উপর কখনো স্থানীয় সমাজপতিদের উপর দেয়ার কারণে সঠিক তত্ত্বাবধান ব্যাহত হচ্ছে। শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ বজায় রাখতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহকে রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত রাখা বাঞ্ছনীয়। শিক্ষকদের জীবনমানের বৈষম্যের অবসান না ঘটিয়ে শিক্ষার উন্নয়ন কী করে সম্ভব? আমরা ভুলে যাই, মায়ের পুষ্টিসাধন নিশ্চিত না করলে, শিশু অপুষ্টির শিকার হবে। হচ্ছেও তাই। এই বৈষম্যের কারণে শিক্ষকতায় মেধাবীরা আসছে না। বৈষম্য বিনাশ না হলে এ জাতি মেরুদণ্ড সোজা করে দাঁড়াতে পারবে না। তাকে নির্ভর করতে হবে অন্যের ওপর। আর আমাদের শিশুদের নিয়ে চলতে থাকবে নতুন নতুন এক্সপেরিমেন্ট। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, যেখানে রাজশাহীর আমগাছ চট্টগ্রামে রোপণ করলে ফলের গুণাগুণ বজায় থাকে না, সেখানে আমাদের কর্তাব্যক্তিরা কীভাবে ভাবলেন, ইউরোপ আমেরিকার শিক্ষা পদ্ধতি আমাদের দেশে খুব সহজেই খাপ খাইয়ে নেবে। তাছাড়া জমিতে ভালোভাবে চাষবাদ না দিয়ে ফসল রোপণ করে ভালো ফসল আশা করা দিবাস্বপ্নেরই নামান্তর। যতদিন নীতি-নির্ধারকগণ শিক্ষাকে উত্তম বিনিয়োগ মনে করবেন না, ততদিন শিক্ষার বেহাল দশা কাটবে না। আমরা প্রতিযোগিতামূলক বিশ্বে টিকে থাকার তাগিদে মাতৃভাষার পুষ্টিসাধন না করে বিদেশি ভাষা চর্চায় ব্যস্ত আছি, যা আমাদের মেরু-অস্থির ক্ষয় সাধন করছে। শিক্ষা যে আমাদের মৌলিক অধিকার, এটি প্রায়শই উপেক্ষিত। শিক্ষাকে সর্বজনীনভাবে গড়ে তুলতে না পারলে জাতীয় উন্নয়ন সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে হবে না। রুচিশীল জাতি গঠনের জন্য দৃশ্যমান উন্নয়নের চেয়ে মনোজাগতিক উন্নয়ন বেশি প্রয়োজন, আমাদের তা বুঝতে হবে। শিক্ষা উপেক্ষিত হলে আমাদের পাশ্চাত্যের দাস হয়ে কাল কাটাতে হবে। এক হিসাব বলছে, দেশের ৩০ হাজার প্রতিষ্ঠান জাতীয়করণ করা হলে সরকারের অতিরিক্ত এক হাজার কোটি টাকা খরচ হবে। আশি ও নব্বইয়ের দশকে আন্দোলনের সময় প্রতিষ্ঠান জাতীয়করণের চেয়ে শিক্ষক-কর্মচারীদের স্কেলে অনুযায়ী শতভাগ বেতন প্রদান এবং অন্যান্য আর্থিক সুযোগ-সুবিধা বাড়ানোর বিষয়টিই বেশি গুরুত্ব পায়। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দ্বিতীয় মেয়াদে (২০০৯-১৪) সরকার গঠন করলে এমপিওভুক্ত সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-কর্মচারীদের চাকরি জাতীয়করণের বিষয়টি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ আলোচনার বিষয় হয়ে ওঠে এবং জাতীয়করণ করা হলে সরকারের অতিরিক্ত ৪০ হাজার কোটি টাকার প্রয়োজন হবে। এসব হিসাব আলোচনাতেই থেকেছে। সমস্যার সমাধান হয়নি। হিসাবের নিষ্পত্তিও হয়নি। চলমান আন্দোলনে আরো নানান কথা যোগ হয়েছে। আন্দোলনকারীরা শিক্ষামন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ ও আলোচনা করে কোনো সাফল্যের নিশানা না দেখে এখন প্রধানমন্ত্রীর সাক্ষাৎপ্রার্থী। সেই পর্যন্ত কর্মসূচি চালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত তাদের। এ রকম সময়ে আকস্মিকভাবে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে গ্রীষ্মকালীন ছুটি বাতিল করে দেয়া হয়েছে। আন্দোলকারী শিক্ষকরা একে তাদের আন্দোলন মাঠে মার খাওয়ানোর অভিসন্ধি বলে ভাবছেন। একপর্যায়ে শিক্ষামন্ত্রী এ সময়ে মাধ্যমিক শিক্ষা জাতীয়করণের দাবিকে অযৌক্তিক-অবাস্তব বলেও মন্তব্য করেছেন, যা প্রকারান্তরে ১১ জুলাই থেকে আন্দোলনকারী শিক্ষকদের বাড়তি আঘাত দেয়া। এমনিতেই বাংলাদেশের শিক্ষাখাত অনেকটা মুমূর্ষু। এখন সমন্বিত একমুখী শিক্ষাক্রম দিয়ে একে মারার সাঁড়াশি পর্ব চলছে। কিন্তু এর পক্ষে আনন্দদায়ক, পরীক্ষামুক্ত, হাতেকলমে, সকল বিষয়ে জানা, কর্মমুখী, বৈশ্বিক চাহিদা, চতুর্থ শিল্প বিপ্লব ইত্যাদি বিশেষ গালভরা শব্দ ব্যবহার করা হচ্ছে, সেগুলোই হলো সেই দাওয়াই, যার চমক-ধাঁধা দেখিয়ে দেখিয়ে রোগীর কংকাল-হাড্ডি আরো উন্মুক্ত করা হচ্ছে! শিক্ষার যে আক্ষরিক অথবা অন্তর্নিহিত অর্থ তা আমাদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে অপ্রতুল। যে কোনো শিশুর বেড়ে ওঠার পথপরিক্রমায় সামাজিকীকরণে যে কয়টি প্রতিষ্ঠান সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে সেগুলোর মধ্যে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান অন্তর্ভুক্ত। সেখানে এখনো কর্মমুখী শিক্ষা অনুপস্থিত। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে জীবনের চলার পথে কী কী প্রয়োজনে এবং সেগুলো কীভাবে করতে হবে তা শেখানোর ব্যবস্থা নেই। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে কেবল পড়তে, লিখতে বা হিসাব করতে শেখা পর্যন্ত সীমিত রাখায় কর্মমুখী শিক্ষার দিকটি উহ্যই থেকে যাচ্ছে। দৈনন্দিন জীবনের অপরিহার্য রান্না-বান্না, ট্রাফিক রুলস, প্রাথমিক চিকিৎসা, আত্মরক্ষা, ঘরদোর গোছানো, জামা-কাপড় কাচা, নৈতিক শিক্ষা, খেলাধুলা, সঙ্গীত, নৃত্য, সাঁতারসহ নিত্য জরুরি পর্বগুলো এখানে অনুপস্থিত। শিক্ষার এই ফাঁকা ব্যবস্থা জাতির মেরুদণ্ডকে মোটেই পোক্ত করছে না। বাংলাদেশে নাগরিকদের শিক্ষার প্রতি রাষ্ট্রীয় দায়িত্বগুলো বর্ণনা করা হয়েছে সংবিধানে। সেসব বিবেচনা করে রাষ্ট্র শিক্ষকদের দিকে তাকিয়ে তাঁদের অধিকার, দাবিদাওয়ার বিষয়টি আরও গুরুত্বসহকারে দেখে সব ধরনের বৈষম্য নিরসনে দ্রুত শিক্ষা জাতীয়করণের পদক্ষেপ গ্রহণ করবে, এমন প্রত্যাশা রইল। প্রধান মন্ত্রী শেখ হাসিনার কাছে বেসরকারী শিক্ষক সমাজের প্রাণের দাবী একটায় সেটা হলো সরকারী ও বেসরকারী শিক্ষকদের পাহাড়সম বৈষম্য দূর করতে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান একযোগে জাতীয়করণ করা। এ ঘোষনার অপেক্ষায় শিক্ষক সমাজ তীর্থের কাকের ন্যায় চেয়ে আছেন।

বেসরকারি শিক্ষকদের জীবনমানের উন্নতি ছাড়া স্মার্ট বাংলাদেশ গড়া সম্ভাব নয়

লেখক: সিনিয়র সাংবাদিক, কলামিস্ট,

3 / 3